**ধানের আধুনিক চাষ পদ্ধতি**

ধানকে ইংরেজীতে বলে Rice, বৈজ্ঞানিক নাম: *Oryza sativa*; এটা গ্রামিনী( Gramineae) পরিবারের আওতাধীন অন্যতম এবং প্রধান মাঠ ফসল এবং আমাদের বিভিন্ন খাদ্যশস্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে কিছুক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন।

উফশী ধানের ফলন উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। তাই জাত নির্বাচন থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত সব কাজ ধারাবাহিক ভাবে বিচক্ষণতার সাথে করতে হবে। নিয়মের হেরফের অথবা অনুমোদিত পদ্ধতি সঠিক ভাবে অনুসরন না করলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং আশানুরুপ ফলন থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

[**উপযোগী জমি ও মাটি**](http://www.krishibangla.com/page/109#sec-7)

অতি লোনা ও বেলে জমি ছাড়া আর সব রকম মাটিতেই ধানের চাষ করা যায়। তবে শুধুমাত্র বন্যামুক্ত এলাকাতেই খরিপ মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করা হয়। বোরো মৌসুমে যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করা যায়।

**জাত নির্বাচন:**

এ সম্পর্কে জানতে আমাদের পজাত পরিচিতি অংশে খোঁজ করুন।

**বীজ বাছাই:**

বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিস্কার ও পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভালভাবে বীজ বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রায় ৪০ লিটার পরিস্কার পানিতে দেড় কেজি ইউরিয়া সার মিশিয়ে দিন। এবার ৪০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন। ভারী, পুষ্ট, সুস্থ ও সবল বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপরিপুষ্ট, হালকা, রোগা বা ভাঙ্গা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো পৃথক করে নিন। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিস্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসাবে বীজতলায় ব্যবহার করা যায়। কুলা দিয়ে ঝেড়ে বীজ বাছাই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এতে চিটা দূর হলেও অপরিপুষ্ট বীজ দূরীভূত হয় না।

[**বীজতলা তৈরি**](http://www.krishibangla.com/page/109#sec-10)

বীজতলা তৈরির আগে সারণী ২ দেখে জেনে নিতে হবে কখন কোন জাতের ধানের বীজ বীজতলায় বপন করতে হবে। চারটি পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করা যায়। এগুলো হচ্ছে শুকনো, কাদাময়, ভাসমান ও ডাপোগ বীজতলা।

**শুকনো বীজতলা**

উপযুক্ত আদ্রতায় ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটিকে একেবারে ঝুরঝুরে করার পর জমি সমান করতে হবে। এবার এক মিটার চওড়া করে জমির দৈর্ঘ্য বরাবরে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ২৫-৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা তৈরি করতে হবে। বেডের উপরিভাগের মাটি ভালোভাবে সমান করার পর শুকনো বীজ সমান ভাবে ছিটিয়ে দিন। এখন উপরের মাটি এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যেন বীজগুলো ২.৫-৪.০ সেন্টিমিটার (১.০-১.৫ ইঞ্চি) মাটির নিচে চলে যায়। এ কাজকে সহজ করতে ধুলা-মাটির আস্তরণ দেওয়া যায়। বেডের মাটিতে প্রয়োজনীয় আদ্রতা নিশ্চিত করার জন্য নালা ভর্তি করে সেচ দেওয়া উচিত।

**কাদাময় বীজতলা**

দোঁআশ ও এটেল মাটি এ বীজতলার জন্য ভাল। প্রতি বর্গমিটার জমিতে দুই কেজি হারে জৈব সার ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর জমিতে ৫-৬ সেন্টিমিটার পানি দিয়ে দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন রেখে দিন এবং পানি আটকিয়ে রাখুন। আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার এক মিটার চওড়া করে জমির দৈর্ঘ বরাবরে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ২৫-৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা তৈরি করতে হবে। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। কাদা বেশি হলে বীজ মাটিতে ডুবে যাবে এবং তাতে ভালভাবে বীজ গজাবে না। এ অবস্থায় বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টা পর বীজ বোনা দরকার।

**ভাসমান বীজতলা**

বন্যা কবলিত এলাকায় যদি বীজতলা করার মতো উঁচু জায়গা না থাকে বা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা তৈরির প্রয়োজনীয় সময় না পাওয়া যায় তাহলে বন্যার পানি, পুকুর, ডোবা বা খালের পানির উপর বাঁশের চাটাইয়ের মাচা বা কলাগাছের ভেলা করে তার উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ কাদার প্রলেপ দিয়ে ভেজা বীজতলার মত ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যায়। বন্যার পানিতে যাতে ভেসে না যায় সেজন্য বীজতলা দড়ি বা তার দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা দরকার। পানিতে ভাসমান থাকায় এ বীজতলায় পানি সেচের দরকার হয় না।

**ডাপোগ বীজতলা**

বন্যা কবলিত এলাকার জন্য ডাপোগ বীজতলা করা যায়। বাড়ীর উঠান, পাকা বারান্দা বা যে কোন শুকনো জায়গায় চারিদিকে মাটি,কাঠ,ইট বা কলাগাছের বাকল দিয়ে চৌকোণা করে নিতে হবে। এবার কলাপাতা বা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ঘন করে অঙ্কুরিত বীজ বুনতে হবে। এ বীজতলার নীচে আচ্ছাদন থাকায় চারা মাটি থেকে কোনরূপ খাদ্য বা পানি পায় না বলে ৫-৬ ঘন্টা পরপর ভিজিয়ে দিতে হবে এবং দু’সপ্তাহের মধ্যেই চারা তুলে রোপন করতে হবে। অন্যথায় চারা খাদ্যের অভাবে মারা যেতে পারে।

**বীজ জাগ দেয়া:**

বাছাইকৃত বীজ কাপড় বা চটের ব্যাগে ভরে ঢিলা করে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে রাখুন ২৪ ঘন্টা। এরপর বীজের পোটলা পানি থেকে তুলে ইট বা কাঠের উপর ঘন্টাকানেক রেখে দিন পানি ঝরার জন্য। এবার বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২/৩ পরত শুকনো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের পোটলা রাখুন এবং আবারও ৩/৪ পরত শুকনো খড় দিয়ে ভালোভাবে চেপে তার উপর ইট বা কাঠ অথবা যেকোন ভারি জিনিস দিয়ে চাপা দিন। এভাবে জাগ দিলে ৪৮ ঘন্টা বা ২ দিনেই ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং কাদাময় বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

**বীজ তলায় বীজ বপন:**

সতেজ ও সবল চারা আমাদের প্রধান কাম্য। তাই বাছাইকৃত বীজ ওজন করে নিতে হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম বীজ বোনা দরকার। এরূপ ১ বর্গমিটার বীজতলার চারা দিয়ে ২৫-৩০ বর্গমিটার জমি রোপণ করা যাবে। উল্লেখ্য যে,ডাপোগ বীজতলার জন্য প্রতি বর্গমিটারে ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বুনতে হবে এবং শুকনো বীজতলার জন্য বীজ জাগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভেজা বীজতলায় বীজ বেডের উপর থাকে বলে পাখিদের নজরে পড়ে। তাই বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিতে হবে। সারণী ২-এ জাত-ভিত্তিক বীজ বপনের সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

**বীজ তলার পরিচর্যা:**

বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখা দরকার। বীজ গজানোর ৫-৬ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রন করা যায়। বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড়বাড়তি ব্যহত হয়। একারণে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডাজনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড়বাড়তি বৃদ্ধি পায়। বীজতলায় আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দেখা দিলে তা দমন করার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজতলায় চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরিপ্রয়োগ করা দরকার। ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগের পর বীজতলার পানি নিস্কাশন করা উচিত নয়।

**চারা উঠানো ও পরিবহন:**

**চারা উঠানো**

চারা উঠানোর আগে বীজতলায় বেশি করে পানি দিতে হবে যাতে বেডের মাটি ভিজে একেবারে নরম হয়ে যায়। চারা উঠাতে এমন সাবধানতা নিতে হবে যেন চারাগাছের কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙ্গে না যায়। উঠানো চারার মাটি কাঠ বা হাতে আছাড় না দিয়ে আস্তে আস্তে পানিতে নাড়াচাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, চারাগাছের শিকড় ছিঁড়ে গেলেও রোপনের পর চারার বাড়-বাড়তির কোনরূপ অসুবিধা হয় না কিন্তু কান্ড মুচড়ে গেলে চারাগাছের বেশ ক্ষতি হয়। এজন্য চারা উঠানোর পর ঐ চারার পাতা দিয়ে বান্ডিল বাঁধাও উচিত নয়। শুকনো খড় ভিজিয়ে নিয়ে বান্ডিল বাঁধতে হবে।

**চারা বহন**

বীজতলা থেকে রোপণ ক্ষেতে চারা বহন করার সময় পাতা ও কান্ড মোড়ানো রোধ করতে হবে। এজন্য ঝুড়ি বা টুকরিতে সাজিয়ে চারা বহন করা উচিত। বস্তাবন্দী করে ধানের চারা বহন করা উচিত নয়।

**চারা রোপনের জন্যে জমি তৈরি:**

জমিতে হেক্টরপ্রতি ৩-৫ টন জৈবসার ছিটিয়ে দিন। এখন ৫-১০ সেন্টিমিটার পানি দিয়ে দুটি চাষ আড়াআড়ি ভাবে দিয়ে ৭-৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এবার ১০-১৫ সেন্টিমিটার গভীর করে আড়াআড়ি ভাবে দুটি চাষ ও দুটি মই দিয়ে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর দিতে হবে শেষ চাষ। এ চাষের আগেই ইউরিয়া সারের ১ম কিস্তি এবং সম্পূর্ণ ফসফেট, পটাশ, জিপসাম ও দস্তা সার ছিটিয়ে চাষ শুরু করতে হবে। সারের পরিমাণ সার ব্যবস্থাপনা অংশ থেকে দেখে নিতে হবে।

**চারা রোপন:**

**চারার বয়স**

ভাল ফলন পেতে হলে উপযুক্ত বয়সের চারা রোপন করা জরুরি। সারণী ২ তে জাত ও মৌসুম ভেদে চারার বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ ভাবে আউশে ২০-২৫ দিন, রোপা আমনে ২৫-৩০ দিন এবং বোরাতে ৩৫-৪৫ দিন হওয়া উচিত।

**রোপনের নিয়ম**

রোপনের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে । প্রতি গুছিতে ২-৩ টি চারা রোপন করা ভাল। মাটির ২-৩ সেমি গভীরতাই চারা রোপন করা উত্তম। সঠিক গভীরতায় চারা রোপন করলে চারার বৃদ্ধি দ্রুত শুরু হয় এবং কুশির সংখ্যা বেশি হয়।

**চারা রোপনের দূরত্ব**

সারিবদ্ধ ভাবে চারা রোপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব বজায় রাখতে হবে (সারণী-২)। এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্দিষ্ট পরিমান জমিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গুছি থাকলে নির্দিষ্ট ফলন হবে। আবার সারিবদ্ধ চারা রোপন করলে নিরানি যন্ত্র ব্যবহার করা যায় তাতে খরচ কমবে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারার দূরত্ব সঠিক হতে হবে। উপরন্তু সঠিক দূরত্বে চারা রোপন হলে প্রত্যেক গাছ সমানভাবে আলো, বাতাস ও সার গ্রহণের সুবিধা পাবে; আর তা ভাল ফলনে সহায়তা দিবে।

**বিকল্প চারা**

বন্যা কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে ফসল নষ্ট হলে যেসব জায়গায় ধান নষ্ট হয়নি সেখান থেকে কুশি ভেঙ্গে নিয়ে অন্যত্র রোপন করা যায়। এতে ফলনের কোন ঘাটতি দেখা যায় না। প্রতিটি গোছা থেকে ২-৩ টি কুশি রেখে বাকিগুলো আলাদা করে অন্য জায়গায় প্রতি গোছায় দুটি করে রোপন করলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

**সার ব্যবস্থাপনা:**

সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ফসল, মাটি এবং পরিবেশের জন্য ভাল। এজন্য প্রথমে জানতে হবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক মাটির উর্বরতা শ্রেণী ( সারণী ৩) এবং জেনে নিতে হবে জমি কোন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সে অনুযায়ী সারণী ৪-এ মৌসুম-ভিত্তিক সারের সুষম মাত্রার সুপারিশ দেওয়া আছে। ফসফেট, পটাশ, জিপসাম ও দস্তা সারের প্রভাব পরবর্তী ফসল পর্যন্ত থাকে। এ জন্য রবি ফসলে ফসফেট, পটাশ ও জিপসাম সার সারণী ৪ মোতাবেক ব্যবহার করলে দ্বিতীয় ফসলে উল্লিখিত সারগুলোরে মাত্রা অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। দস্তা সার একবার প্রয়োগ করলে তা পরের তিন ফসলে প্রয়োগ করতে হবে না। সারণী ৫-এ জাত ও মৌসুম ভিত্তিক ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সময় ও কিস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা জমিতে কম সময় থাকে তাই এ সার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, ২য় কিস্তি ধানের গোছায় ৪-৫টি কুশি অবস্থায় ও ৩য় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ পূর্বে দিতে হবে। যে সব জাতের জীবণকাল ১৫০ দিনের বেশি সেক্ষেত্রে জমি তৈরির সময় ইউরিয়া প্রথম কিস্তি এবং পরে সমান তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সময় মাটিতে অবশ্যই প্রচুর রস থাকতে হবে। সবচাইতে ভাল হয় যদি ক্ষেতে ২-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাতে বা উইডার দিয়ে আগাছা পরিস্কার করা দরকার। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরেও ধানগাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়বাড়তি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। এরপর হেক্টরপ্রতি ৬০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ৮ কেজি জিপসাম সার উপরি-প্রয়োগ করলে ফল পাওয়া যাবে। যদি ধানগাছ মাঝেমধ্যে খাটো হয়ে বসে যায় এবং পুরাতন পাতায় মরচে পড়া বাদামী থেকে কমলা রঙ ধারণ করে এবং ধানের কুশি কম থাকে তখন ধরে নিতে হবে দস্তার অভাব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। এরপর হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ১ কেজি ৩৫০ গ্রাম দস্তা সার উপরি-প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ কেজি জিংক সালফেট ১২৫-১৫০ গ্যালন পরিস্কার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে দু’কিস্তিতে যথাক্রমে রোপণের ১০-১৫ ও ৩০-৩৫ দিন পর ধানগাছের পাতার উপর ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এভাবে মূল্যবান দস্তা সারের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

**আগাছা দমন:**

আগাছা ধানগাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্য উপাদানের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আগাছা প্রতিক্থল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ধানগাছের চেয়ে অধিক হারে বাড়তে পারে। সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের চেয়ে আউশ মৌসুমে, বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। আউশ মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু’একটি চাষ দিয়ে পতিত অবস্থায় রেখে দিলে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। কিছুদিন পর পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে ধানের বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব অনেকাংশে কমে যায়। রোপা ধানের জমিতে ৫-১০ সেন্টিমিটার পানি রখিলে জমিতে আগাছা কম জন্মায়। সাধারণত ধানগাছ রোপনের পর থেকে পাকা পর্যন্ত যতদিন মাঠে থাকে তার তিন ভাগের প্রথম এক ভাগ সময় আগাছামুক্ত রাখলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৩০-৪০ দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৪০-৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা উচিত। হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে, আগাছানাশক ব্যবহার করে এবং জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায়। হাত দিয়ে আগাছা দমন অপেক্ষাকৃত সহজ। রোপা ধানে কমপক্ষে দুবার আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার ধান লাগানোর ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর। জমিতে পানির পরিমাণ ১০-১৫ সেন্টিমিটার রাখতে পারলে দুবার হাত নিড়ানি দিলেই হবে। যদি আউশ বা আমন মৌসুমে জমি শুকিয়ে যায় বা বোরো মৌসুমে সেচ দিতে দেরি হয় তাহলে আগাছার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তখন আরেকটি হাত নিড়ানির প্রয়োজন পড়ে। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহারে দু’সারির মাঝের আগাছা নির্মুল হয়। কিন্তু দু’গুছির ফাঁকে যে ঘাস থাকে তা হাত দিয়ে তুলতে হবে। উঠানো আগাছা মাটির ভিতর পুঁতে দিলে তা পচে গিয়ে জৈব সারের কাজ করবে। ব্রি উইডার নামের নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা নির্মুল করা যায়।

**আগাছানাশক ব্যবহার**

এ পদ্ধতি অধিকতর কার্য়কর ও সাশ্রয়ী হওয়ায় আগাছানাশকের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তরল, দানাদার ও পাউডার এ তিন ধরনের আগাছানাশক বাজারে পাওয়া যায়। প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান লাগানোর ৩-৬ দিনের মধ্যে এবং পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক আগাছার বৃদ্ধি ও তাপমাত্রাভেদে রোপন/বপনের ১০-২৫ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। কিছু অনুমোদিত আগাছানাশক ও তার ব্যবহার সারণী ৬-এ দেয়া হলো। জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকা অবস্থায় প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হয়। পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক আগাছার বৃদ্ধি ১-২ পাতাবিশিষ্ট হলেই ব্যবহার করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগকৃত জমিতে ৩০ দিন পর আর একবার হালকা হাত নিড়ানির প্রয়োজন হতে পারে।

**জৈবিক আগাছা দমন:**

ভক্ষণকারী জীব, পোকামাকড়,ছত্রাক ও পরজীবির মাধ্যমে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে আগাছা দমন করাই হচ্ছে জৈবিক আগাছা দমন। স্বমন্বিত ধান-হাঁস এমনি একটি জৈবিক আগাছা দমন পদ্ধতি।

ক) ধান-হাঁস চাষ পদ্ধতিতে জমি তৈরির সময় ২০-২৫ মণ গোবর সার মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ধানের চারা রোপনের ৭-১৪ দিন পর ২০-৩০ দিন বয়সের হাঁসের বাচ্চা সারি করে লাগানো ধান ক্ষেতে অবমুক্ত করতে হয় এবং ধানে ফুল আসার আগে হাঁস ধান ক্ষেত থেকে উঠিয়ে নিতে হয়।
খ) হাঁসের বাচ্চা যাতে অন্যত্র না চলে যায় বা এদের সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হলেক্ষেতের চারদিকে জাল দিয়ে বেড়া দিলে ভাল হয়।
গ) হিসাব করে দেখা গেছে, এ পদ্ধতিতে প্রতি বিঘা জমিতে ৪০-৫০ টি হাঁসের বাচ্চার প্রয়োজন।
ঘ) হাঁস কার্যকরভাবে ধানের আগাছা খেয়ে সম্পূর্ণভাবে তা ধ্বংস করে এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে তাদেরকে দমন করে। হাঁসের বিষ্ঠা জমিতে জৈব সারের কাজ করে।
ঙ) এ পদ্ধতিতে আগাছা দমনে কীটনাশক প্রয়োগ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না। ফলে ধান চাষের খরচ অনেক কমে যায়।
এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষক একই সাথে ধান, হাঁস ও ডিম উৎপাদন করতে পারেন।

**সেচ ব্যবস্থাপনা:**

চারা রোপনের পর জমিতে পানি কম রাখতে হবে যাতে চারা তলিয়ে না যায়। ধানের জমিতে সব সময় গভীর পানি ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে একটি পূর্ণ মাত্রায় সেচ দেওয়ার পর পরবর্তী সেচ দেওয়ার আগে জমি তিন দিন শুকনো রাখলে ধানের ফলন তেমন কমবে না উপরন্তু পানির পরিমণি ২৫-৩০ ভাগ কম লাগবে। গভীর নলকূপ এলাকায় এই পদ্ধতিতে প্রায় ৪০ ভাগ জমির পরিমাণ একই পরিমাণ পানি দিয়ে চাষাবাদ বাড়ানো সম্ভব। এ পদ্ধতিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হলে আগাছানাশক প্রয়োগ করা লাভজনক। ধান গাছে কাইচ থোড় আসার আগ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। তবে কাইচথোড় আসা শুরু করলে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি থাকলে ভাল হয়। এছাড়াও আমন ধান কাটার পর জমি পতিত না রেখে একটা বা দুটো চাষ দিয়ে ফেলে রাখলে বোরো মৌসুমে জমি তৈরিতে শতকরা ২০ ভাগ পানি কম লাগবে। কারণ পতিত জমিতে ফাটল ধরলে জমি তৈরির সময় ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণ পানির অপচয় হয়। সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি কমিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হয় এবং ২-৩ দিন পর আবার পানি দিলে সারের কার্য়কারিতা বৃদ্ধি পায়। জমিতে পানি ধরে রাখলে দানাদার কীটনাশকের গুণাগুণ বাড়ে। ধান পাকার সময় দানা শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়। আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টির পানির সাহায্যে ভালভাবেই উফশী ধানের চাষ করা যায়। বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে চাষ করতে হলে ক্ষেতে পানি ধরে রাখার জন্য আইল ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে।

**সেচের পানির অপচয় রোধ**

এ অপচয় রোধকল্পে পিভিসি অথবা প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানির অপচয় বন্ধের সাথে সাথে সেচ খরচও কমানো যায় কারণ এ অবস্থায় গভীর নলক্থ্থপ থেকে কাঁচা নালার সেচের তুলনায় শতকরা ৪২ ভাগ বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া অঙ্কুরিত বোনা ধানের চাষ করে পানির কার্যক্ষমতা শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

**সম্পূরক সেচ**

বৃষ্টি নির্ভর ধান চাষে খরা মোকাবেলা করার জন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, দুবারে ১৫২ মিলিমিটার সম্পূরক সেচ দিয়ে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ ফলন বাড়ানো যায়। বৃষ্টি-নির্ভর খরা কবলিত ধানের চেয়ে সম্পূরক সেচযুক্ত ধানের ফলন হেক্টরে প্রায় ১ টন বেশী হয়। অগভীর কিংবা গভীর নলক্থপ ছাড়াও পুকুর পদ্ধতিতে খরা মোকাবেলা করা যায়। এ জন্য ধানি জমির আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ জায়গায় ২ মিটার গভীর করে পুকার কেটে নিতে হবে। এ ছোট পুকুরে যে পরিমাণ পানি ধরে রাখা যাবে তা দিয়ে খরার সময় রোপা আমন ধানকে রক্ষা করা যায়। উপরন্তু ছোট পুকুরে মাছ চাষও করা যায়।

তথ্য সূত্র:

১। http://www.krishibangla.com

২।আধুনিক ধানের চাষ, বি আর আর আই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৩। সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ম্যানুয়াল, কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪। বি আর আর আই ওয়েব সাইট।